দৈনিক বাংলা

03 OCT 1988

077 পৃষ্ঠা ... 5 ... 3

ক্লাস শুরু হয়েছে এরপর—

অক্টোবরের পয়লা তারিখ থেকে ঢাকার স্কুল-কলেজগুলোর বেশির ভাগই খুলেছে। বাকীগুলি এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। তার কিছু কিছুতে বন্যার্ত এখনও রয়ে গেছে—আর কিছুতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ দূষণমুক্ত করার কাজ চলছে। তবে দশ তারিখের মধ্যেই সব কটি খুলে দেয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বরের এক থেকে ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত চারটি সপ্তাহ ক্লাস চলতে পারেনি। কারণ বন্যার পানি। রাজধানীর দুশ চৌবট্টিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে একশ পঁয়ত্রিশটিতেই বন্যাবিপন্নদের জন্য ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল। বাদবাকিগুলোতে বাধ্য হয়েই ছুটি দিতে হয়েছিল।

সেশনজটের এই যুগে স্কুল-কলেজগুলোকে এই জটিলতা থেকে মুক্ত বলা চলে। অন্তত এইচএসসি অবধি শিক্ষার্থীর জন্য সময়ক্ষেপণের প্রতিবন্ধকতা নেই কোথায়ও. যতো ধীর প্রবাহ বা অবরুদ্ধতা, সবই তার পরে।

স্কুল-কলেজের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিষয়টি ভেবে দেখার দরকার বিশেষভাবে এ কারণেই। সাম্প্রতিক দুর্বার জলস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক কিছু, শুধু স্তব্ধ করেছে ছাত্র-ছাত্রীদের কলরব। এই স্তব্ধতা যে সাময়িক, এর প্রভাব যে সুদূর প্রসারী বা দীর্ঘস্থায়ী কিছু নয়, প্রমাণ করতে হবে এ সত্যটাই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো কঠিন। সময়ে সময়ে প্রকৃতি হতেই পারে, রুদ্র, ভয়ংকর। কিন্তু ঐ রুদ্রতাই সব নয়। এর পরেও মানুষ সব কাটিয়ে ওঠে—সাফল্যকে করায়ত্ত করে, এগিয়ে যায় অপ্রতিহত গতিতে। মাঝে মাঝে বাধা বিপত্তি আসে বলেই মানুষ যেন নিজেকে বেশি করে চিনতে পারে, প্রত্যয়ী হতে পারে, বলিষ্ঠ হতে পারে।

বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাও এ দিকটা সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে, পারার অবকাশ এবার হয়েছে। এবারের বন্যা মোটামুটি ভাবে স্পর্শ করেছে সকলকে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। সে হিসেবে তারাও বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে। হাজার পাতা কেতাবী বর্ণনায় যা সম্ভব হতো না, চোখের দেখায় তা উপলব্ধিতে সহজ হয়েছে।

সমষ্টিগত ঐক্যে সমন্বিত প্রচেষ্টায় মানুষ অতীতেও সফল হয়েছে—ভবিষ্যতেও হতে পারবে।

তাই এই এক মাসের পড়া-লেখার ক্ষতি সম্পর্কে আক্ষেপটাকে বড় করে তুলে ধরা সমীচীন হবে না কোনোক্রমেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ মুহূর্তের বড় দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সামনে আশাব্যঞ্জক দিকটি তুলে ধরাই।

একটি মাস, দিনপঞ্জীর হিসাবে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে এই সেপ্টেম্বর এমনই একটি মাস, যে মাসে ছুটির আধিক্য কম, সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া আর ছুটি নেই। 'বার্ষিক' ও 'নির্বাচনী' পরীক্ষা নবেম্বরেই হয় বলে আর অক্টোবরে পূজোর ছুটি পড়ে বলে এ মাসে পড়া-লেখার একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সচরাচর থাকে। বছরের শুরুর দিকের শিথিলতা শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে উবে যায়, বর্ষ শুরুর ঝক্কি-ঝামেলা থেকে কর্তৃপক্ষেরও মুক্ত হয়ে একাডেমিক পরিবেশে মন দেয়ার সুযোগ ঘটে। তাই সেপ্টেম্বরের এই বিপর্যয়ে অনেকে আশাহত হতে পারেন—বছরের এই ক্ষতি কী করে সামাল দেবেন?

একটি কথা মনে করলেই মানসিক দ্বিধাটা কেটে যাবে—তা হচ্ছে বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের সবকটি প্রতিষ্ঠানই একই সঙ্গে এই বিপত্তি মোকাবিলা করেছে। তাই শিক্ষার্থীদের গতি আছে একই স্তরে। পিছিয়ে পড়ার শংকাটি আর উঠছে না—যে শংকা শংকিতই করতে পারত আসলে।

স্কুলের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী অবধি. পাঠ্যসূচীর বিন্যাস ঘটানো যেতে পারে—যার মধ্যে পুনরালোচনার বা রিভিশনের একটি প্রধান অংশ থাকবে। অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র দায় হবে না, পেছনেরটাও দেখতে হবে। কারণ একটি মাস শিক্ষার্থীদের কোনো সম্পর্কই ছিল না বইপত্রের সঙ্গে, তাই যা পড়ানো হয়েছিল, তা ঝালাইয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

অর্থাৎ পুরনো পড়া ফের পড়ানোর জন্য যে সময় লাগবে. তাকে অর্থহীন মনে করা সঙ্গত হবে না। আবার শুধু পুরনো পাঠেই সীমিত থাকা সমীচীন হবে না—দুটোই কায়দা করে পাশাপাশি চালাতে হবে।

এজন্য সুনির্ধারিত পরিকল্পনার দরকার হবে। সময় সংকুলান না হলে প্রয়োজনে পাঠ্যসূচী কিছু সংকুচিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাও যুক্তি সঙ্গতভাবে। সকলে মিলে আলোচনা করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে রূপরেখা তৈরি করে নিলে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কল্যাণের হতে পারে।

স্কুলের পরীক্ষার তারিখও কিছুটা পেছানো যায় কিনা. সে ভাবনাও করা যায়। ডিসেম্বরের শুরুতে বা মাঝামাঝিই ফলাফল ঘোষণা না করে ডিসেম্বর মাসটি পার করে নতুন বছরে ফল দেয়া যায়। এতে পুরো নবেম্বর-ডিসেম্বর হাতে পাওয়া যায়। এমনি করে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমঝোতা করে নিতে পারলে দেখা যাবে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

দশম শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক শিক্ষাবোর্ডের নির্ধারিত তারিখের। যেমন দশম শ্রেণীর নির্বাচনীর ফলাফল পর্যন্ত সব তারিখ নির্ভরশীল শিক্ষাবোর্ডের ফরম পূরণের প্রদত্ত তারিখের ওপর। এক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে শিক্ষা বোর্ডের চিন্তা-ভাবনার। ডিসেম্বরেই ফরম পূরণের তারিখ থাকে সাধারণত এবং তা প্রথম দিকেই, বড়জোর মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়। তাতে করে স্কুলগুলোকে পরীক্ষা নবেম্বরের দশ তারিখের পরেই নেয়ার উদ্যোগ নিতে হয়। দশটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া, প্র্যাকটিক্যাল গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন, টেবুলেশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ—নির্বাচনী পরীক্ষার প্রতিটি স্তরই সময় সাপেক্ষ এবং ধীর স্থির বিবেচনা প্রসূত। যেহেতু শিক্ষা বোর্ডের ফাইনালে সাধারণত দুবেলা পরীক্ষা গৃহীত হয় না, হলেও একমাত্র ইংরেজী ও বাংলা, সেহেতু স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাও দুবেলায় দু'বিষয় দিতে গেলে শিক্ষার্থীরা স্বস্তিবোধ করে না। উত্তরপত্র মূল্যায়নেও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়টুকু না দেওয়া হলে সুবিচার আশা করা যায় না। এমনি নানান ছোট-বড় কারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নির্বাচনী পরীক্ষা পর্ব সম্পন্ন করলে প্রহসনে পরিণত হওয়ার আশংকা। এ জন্যই বোর্ডের বিশেষ বিবেচনা অবশ্যই দরকার—এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের শুরু ও শেষ তারিখ সঙ্গত সময়ের জন্য পেছানো যায় কিনা।

একই কথা এইচএসসি সম্পর্কেও। নির্বাচনী পরীক্ষা অবধিই ছাত্রছাত্রী আসে কলেজে, ক্লাসে। এর পরে তাদের আর পার্সেনটেজ-এর ভয় থাকে না, তাই আর কোনওভাবেই তাদের ক্লাসে টানা যায় না। নির্বাচনী পরীক্ষাটা যতোই পেছানো যাবে ততোই তা কলেজের কাজে লাগবে। হোম, টিউটোরিয়াল বা প্রাইভেট কোচিং-এ শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করলেও তা আর কতো পার্সেন্টের। কলেজই তো ভরসা বিপুল সংখ্যকের।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময়সীমাও বাড়িয়ে দেয়ারও দরকার আছে। বন্যা চলে গেলে পরবর্তী যে সমস্যা আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে মানুষকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এ সময়ে শিথিলতা জনস্বার্থেই যাবে। হয়তো বাড়ানো হবে। কিন্তু যতো দ্রুত খবরটা জানিয়ে টেনশন কমিয়ে নিরুপায় অভিভাবককে স্বস্তি দেয়া যায় ততোই ভালো।

অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনের সর্বস্তরে নতুন করে নতুন কিছু ভাবতে হবে। নিয়ম তৈরি করা হয় মানুষের জন্যই, বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে, সময় বুঝে। এইসব বিবেচনা, পুনর্বিবেচনা ফলাফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সকলকেও বাস্তব অনুধাবন করতে হবে। উৎকণ্ঠার দরকার নেই এইচএসসির ফলের বিলম্বে। মাত্র জীবনপ্রবাহ ফিরে এসেছে, সেইসঙ্গে কর্মের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। সবই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। পারস্পরিক বিশ্বাস আস্থা ও শ্রদ্ধা এই পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের লগ্নে বড় জরুরী। মনে রাখা ভালো, মনে করাই ভালো, এমন বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সকলেই আছি সবার সঙ্গে, এই থাকাটা সকলেরই স্বার্থে, সকলের কল্যাণে।

স্কুলের যে শিশুটি এই এক মাসে তার চেনা অক্ষর আর নামতা অংক ভুলে গেছে, তাকে ভুলে যাওয়ার জন্য দণ্ডিত না করে অথবা এড়িয়ে না গিয়ে আবার অক্ষর শেখানো থেকেই শুরু করতে হবে। এই সত্য সবক্ষেত্রে। নতুন করে শুরু করতে হলে তা-ই করতে হবে।

যা হতে পারত, যা এতোদিনে হয়ে যেত, তার জন্য আফসোস না করে যা হয়েছে তাকে মেনে নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। লক্ষ্য রাখা দরকার, যে সময়টা হারিয়ে গেছে, তার জন্য হাহাকারে আবার না এর চেয়েও বেশি সময় হারাই। তা হলে যে ক্ষতি হবে, তা অপূরণীয়।

অনেকের প্রবণতা আছে, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে না দেখে আপন ছন্দে এগিয়ে যাওয়ায়। যেমন অনেক বা কিছু কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। সিলেবাস শেষ করার দুর্দম নেশায় নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান নির্দেশ দেন। 'আমি ক্লাসে নতুন পড়া দিই, বুঝে নাও, পুরনোটা বাড়িতে দেখে নিও।

শিক্ষার বিষয়টা লোক দেখানো আড়ম্বর যে নয়, এ নিয়ে তাই প্রমাণিত হয়। এজন্য এ দুর্যোগেও আমি বা আমাদের প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পাঠের সবটাই শেষ করে ফেলেছি'—এমন আত্ম তুষ্টির অবকাশ আদৌই নেই। নেই মানুষ মেশিন নয় বলেই।

—হোসনে আরা শাহেদ